Ministry of Culture
Government of India

AUGUST 2026

MONTHLY BULLETIN

VOLUME LV, NO. 8

THE ASIATIC SOCIETY

(AN INSTITUTION OF NATIONAL IMPORTANCE)

1 PARK STREET ● KOLKATA-700016

CONTENTS

Administrator's Page 1

Meeting Notice 3

Paper to be Read

- রাঢ় বাংলার লৌকিক সংস্কৃতি 4
  আশিস গিরি

In Memoriam

- অধ্যাপক প্রবাল দাশগুপ্ত: কায়াবাদে স্মৃতিতর্পণ 6
  মহীদাস ভট্টাচার্য্য

Heritage Matters

- বাংলার মন্দির-টেরাকোটায় প্রথামুক্ত দেবীমূর্তি: ইটন্ডার এক অনন্য রূপকল্পের বিশ্লেষণ 9
  অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

Events

- दादी-नानी की कहानियों से कठपुतली, नवरस तक... 'शब्द' की पूरी दुनिया समेटता है नेशनल लाइब्रेरी में बना 'म्यूजियम ऑफ वर्ड' संग्रहालय 15
  बबीता माली

Books from Reader's Choice

- Polity, Judiciary and Origin of Constitutional Morality in Colonial Bengal (1774-1856) 19
  Rangankanti Jana

Administrator's Page

Dear Members and Readers!

It is indeed a great privilege to reach out to Members and Readers through this Bulletin. The Asiatic Society observed the 12th International Day of Yoga on 21 June 2026 with great enthusiasm, witnessing active participation from its officials.

On the occasion of Paschimbanga Diwas 2026, a Book Exhibition was formally inaugurated by the undersigned on 20 June 2026 as part of the commemorative observances. The Asiatic Society paid homage to Syama Prasad Mookerjee, a patriot, educationist, parliamentarian, statesman, humanitarian, former Vice-Chancellor of the University of Calcutta, and President of The Asiatic Society (1942–1944), on the occasion of his 73rd death anniversary on 23 June 2026.

A day-long seminar on Remembering Ram Comul Sen (1783–1844), the first Indian Secretary of The Asiatic Society, in collaboration with S. A. Jaipuria College was organized on 30 June 2026 at the Humayun Kabir Hall of The Asiatic Society. The seminar was convened to commemorate the life, achievements and enduring legacy of Ram Comul whose distinguished service and intellectual contributions played a pivotal role in the advancement of the Society during the early nineteenth century.

Shri Vivek Aggarwal, IAS, Secretary, Ministry of Culture, Government of India, and Lt. Col. Dr. Anant Sinha, Administrator, The Asiatic Society with other dignitaries at the inauguration of the 'Museum of Word'.

The undersigned had the pleasure to attend the valedictory session of the Animal Taxonomy Summit (ATS 4.0), organized by the Zoological Survey of India (ZSI) in Kolkata on 2 July 2026. The occasion was graced by Shri Kirti Vardhan Singh, Union Minister of State for Environment, Forest & Climate Change and External Affairs, Government of India.

To commemorate the 125th Birth Anniversary of Dr. Syama Prasad Mookerjee, former President of the Society, The Asiatic Society organized a special exhibition featuring books authored by and related to him, along with selected proceedings of the Society's meetings from its rich archival collection on 6 July 2026. A Book Exhibition-cum-Recommendation Programme for the procurement of books was organized on the same day at the premises of The Asiatic Society.

The Asiatic Society welcomed 30 students and 2 faculty members from Batch 1 of the IDC course in Library and Information Studies, Loreto College, Kolkata, on 17 June 2026.

The Asiatic Society had the privilege of participating in the inauguration of the Museum of Word at the National Library of India, Kolkata on 19 July 2026. The Museum of Word was inaugurated by Shri Amit Shah, Hon'ble Union Home Minister and Minister of Cooperation, Government of India, in the august presence of Shri Suvendu Adhikari, Hon'ble Chief Minister, Government of West Bengal, Shri Swapan Dasgupta, Minister of Finance, Government of West Bengal, Shri Gouri Sankar Ghosh, Minister-in-Charge, Department of Mass Education Extension & Library Services, Government of West Bengal, Shri Govind Mohan, Union Home Secretary, Shri Vivek Aggarwal, Secretary, Ministry of Culture, Government of India, Mrs. Lily Pandeya, Joint Secretary (Museums), Ministry of Culture, Government of India, and several other distinguished dignitaries. As part of this prestigious national initiative, The Asiatic Society contributed four rare manuscripts from its invaluable collection for public display at the Museum of Word. Among these are the celebrated manuscripts of Prithviraja Rasau and Insha-i-Ghalib, exemplifying the Society's rich repository of India's literary, linguistic, and cultural heritage.

The Asiatic Society is proud to contribute to this landmark initiative, thereby reaffirming its steadfast commitment to the preservation, promotion, and dissemination of India's invaluable literary and cultural heritage for the benefit of present and future generations.

We look forward to your continued cooperation and active engagement in the Society's forthcoming programmes and initiatives.

I wish you a happy reading.

The Asiatic Society
Kolkata

Dr. Anant Sinha
Lieutenant Colonel
Administrator, The Asiatic Society

Ministry of Culture
Government of India

SIR·WILLIAM·JONES
MDCCXLVI·MDCCXCIV

AN ORDINARY MONTHLY GENERAL MEETING OF THE ASIATIC SOCIETY WILL BE HELD ON MONDAY, 3rd AUGUST 2026 AT 5 P. M. AT THE ASIATIC SOCIETY, 1 PARK STREET, KOLKATA - 700016 IN HYBRID MODE

MEMBERS ARE REQUESTED TO KINDLY ATTEND THE MEETING

AGENDA

1. Confirmation of the Minutes of the last Ordinary Monthly General Meeting held on 6th July 2026.
2. Exhibition of presents made to the Society in July 2026.
3. Notice of Intended Motion, if any, under Regulation 49(d).
4. Matters of current business and routine matters for disposal under Regulation 49(f).
5. The following paper will be read by Dr. Ashis Giri: 'Rarh Banglar Loukik Sanskriti'

1 Park Street, Kolkata-700016
Dated : 20.07.2026

Dr. Anant Sinha
Lieutenant Colonel
Administrator, The Asiatic Society

Paper
to be read

রাঢ় বাংলার লৌকিক সংস্কৃতি

আশিস গিরি
অধিকর্তা, ইজেডসিসি

রাঢ় বাংলা—যা মূলত ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীর থেকে শুরু করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত—ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি। লাল মাটির এই ভূমিভাগে একদিকে যেমন সাঁওতাল, কুড়মি, বাউরি ও ভূমিজদের মতো আদিবাসী ও মূলবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা মিশেছে, অন্যদিকে তেমনি গড়ে উঠেছে আর্য ও প্রাক-আর্য উপাদানের এক অসামান্য সমন্বয়।

রাঢ়ের লৌকিক সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হলো কৃষিনির্ভরতা,প্রকৃতি উপাসনা এবং সমাজবদ্ধ জীবনযাপন।

১. লৌকিক দেবী ও দেব-দেবী

রাঢ় বাংলার ধর্মীয় বিশ্বাসে বৈদিক দেবতাদের চেয়ে লৌকিক দেব-দেবীদের প্রাধান্য বেশি। এঁরা মূলত লৌকিক প্রয়োজন—যেমন ফসল রক্ষা, রোগমুক্তি ও সন্তানকামনায় পূজিত হন।

ধর্মঠাকুর: রাঢ়ের নিজস্ব ও প্রধান লৌকিক দেব হলো 'ধর্মঠাকুর'। ইনি সূর্য, বুদ্ধ ও শিবের এক মিশ্র রূপ বলে বিবেচিত। প্রধানত বাউরি, ডোম ও হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষ এর পূজারি (যাঁদের 'পণ্ডিত' বলা হয়)। কাঠের পিঁড়ি বা রূপহীন শিলাই এখানে পূজিত হয়।

মনসা ও চণ্ডী: সর্পভয় থেকে রক্ষা পেতে মানসা পূজা এবং গ্রামীণ সুরক্ষার জন্য নানা রূপের চণ্ডী (যেমন: মঙ্গলচণ্ডী, ওলাচণ্ডী, ক্ষেত্রপাল) পূজিত হন।

মনসাঙ্গী ও অন্যান্য স্থানীয় দেবতা: কালুরায়, বাবা বাঁকুড়া রায়, বোরোরাম ইত্যাদি নামে অসংখ্য আঞ্চলিক দেবতা রাঢ়ের ঘরে ঘরে পূজিত হন।

২. লৌকিক উৎসব ও ব্রত (লোকপার্বণ)

কৃষিচক্র এবং ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে রাঢ়ের উৎসবগুলো সরাসরি যুক্ত:

গাজন ও চড়ক: চৈত্র সংক্রান্তিতে ধর্মঠাকুর ও শিবের গাজন রাঢ়ের এক প্রধান লোকউৎসব। এখানে সন্ন্যাসীদের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন, বানফোঁড়া, আগুনের ওপর হাঁটা এবং লোকনাট্যের উপস্থাপনা দেখা যায়।

ভাদু: ভাদ্র মাসে ভাদু উৎসব পালিত হয়। ভাদু মূলত এক লৌকিক রাজকন্যার স্মৃতিতে গাওয়া গান ও পূজার রূপ।

টুসু: পৌষ সংক্রান্তিতে টুসু উৎসব হয়। এটি প্রধানত কুমারী মেয়েদের ও নারীদের উৎসব। টুসু গান ও প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে মকর সংক্রান্তি উদযাপিত হয়।

করম ও বাঁধনা (সোহরাই): কার্তিক অমাবস্যায় গবাদি পশুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে এবং তাদের পূজা করতে সাঁওতাল ও কুড়মি সমাজে বাঁধনা বা সোহরাই উৎসব পালিত হয়।

৩. লোকসঙ্গীত ও সুরের ধারা

রাঢ় বাংলার সুর ও গান মাটির মতোই সোঁদা ও প্রাণবন্ত:

বাউল ও ফকিরি গান: বীরভূম ও সংলগ্ন রাঢ় এলাকা বাউলদের আখড়া। লালন, নিতাই ক্ষ্যাপা, সুবল দাস বাউলের মাধ্যমে বিশ্বমঞ্চে সমাদৃত এই গান দেহতত্ত্ব ও আত্মানুসন্ধানের এক গভীর মাধ্যম।

ঝুমুর গান: পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের প্রাণের গান ঝুমুর। মাদল, ধামসা ও বাঁশির তালে প্রেম, বিরহ ও গ্রামীণ জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ ঝুমুর গানে ফুটে ওঠে।

ভাদু ও টুসু গান: সহজ-সরল লোকভাষায় গাওয়া সুর যা রাঢ়ের নারীদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের প্রতিচ্ছবি।

আলকাপ ও বোলান: বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের লোকনাট্যভিত্তিক গান, যাতে সামাজিক ব্যঙ্গ ও হাস্যরস প্রাধান্য পায়।

৪. লোকনৃত্য ও লোকনাট্য

ছৌ নৃত্য : পুরুলিয়া-কেন্দ্রিক বিশ্বখ্যাত মুখাভিনয়-নির্ভর বীররসাত্মক সামরিক নৃত্য। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী এতে রূপায়িত হয়।

রণপা ও কাঠিনৃত্য: উৎসব-পার্বণে যুবকদের দ্বারা পরিবেশিত ভারসাম্য ও দক্ষতার নৃত্য।

পাতা নৃত্য: আদিবাসী উৎসবের অঙ্গ হিসেবে সান্ধ্যকালীন দলবদ্ধ নৃত্য।

রাবণকাটা নাচ: বাঁকুড়া অঞ্চলের রামলীলার এক বিশেষ লৌকিক রূপ।

৫. লোকশিল্প ও হস্তশিল্প

রাঢ়ের শিল্পকলা মাটির সাথে গভীরভাবে জড়িত:

পোড়ামাটির কাজ (টেরাকোটা): বাঁকুড়ার পঞ্চমুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া (বাঁকুড়ার ঘোড়া) সারা বিশ্বে রাঢ়ের সাংস্কৃতিক প্রতীক হয়ে উঠেছে।

পটচিত্র: মেদিনীপুরের পিংলা ও বীরভূমের পটুয়াদের হাত ধরে আজও টিকে আছে পটচিত্র ও পটের গান।

ডোকরা শিল্প: ধাতু গলিয়ে মোম ছাঁচের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী গহনা, মূর্তি ও গৃহস্থালির জিনিস তৈরির প্রাচীন কৌশল (বিশেষ করে বাঁকুড়া ও বর্ধমানে)।

কাঁথা স্টিচ ও বাঁশ-বেতের কাজ: গ্রামীণ মহিলাদের সূচিকর্ম ও হাতের কাজ রাঢ়ের প্রতিটি গৃহস্থালির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

সামগ্রিক গুরুত্ব

রাঢ় বাংলার লৌকিক সংস্কৃতি কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়; এটি একটি জীবন্ত সমাজব্যবস্থা। প্রকৃতি, মাটি এবং সাধারণ মানুষের শ্রমজীবী জীবনের সাথে এই সংস্কৃতির সম্পর্ক নাড়ির। আধুনিক নগরায়ণ ও বিশ্বায়নের যুগেও রাঢ়ের আখড়া, মেলা, গাজন ও মাদলের শব্দে এই লোকসংস্কৃতি তার নিজস্ব সতেজতা ধরে রেখেছে।

অধ্যাপক প্রবাল দাশগুপ্ত: কায়াবাদে স্মৃতিতর্পণ

মহীদাস ভট্টাচার্য্য
প্রাক্তন অধিকর্তা ও অধ্যাপক, ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান শাখা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

স্বনামধন্য ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রবাল দাশগুপ্ত গত পহেলা জুন, ২০২৬ চলে গেলেন। তাঁর আরেকটি পরিচয় – তিনি একজন Espenterist, বিশ্বভাষা এস্পেরান্তোতে তাঁর দক্ষতা গোটা পৃথিবী থেকে স্বীকৃতি পেয়েছে। গোটা বিশ্বে এই ভাষার প্রচার ও অনুশীলনে সময় দিয়েছেন। বাংলায় বাদল সরকারের সঙ্গে এই ভাষার চর্চা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের বহু বিষয় এই ভাষায় অনুবাদ করে বাঙালির সৃষ্টিকে পরিচিতি দিয়েছেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। বয়স ৭২ হয়েছিল, কর্মক্ষম ছিলেন। ঘুমের মধ্যেই এই আকস্মিক প্রয়াণ। মর্মাহত করেছে আমাদেরকে। ভাষাবিজ্ঞানে যে দু-চারজন অভিভাবকের মতো রয়েছেন তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন। ক্ষতি কতখানি হল পরিমাপ করতে গেলেই আফসোস হয়। কারণ তিনি আরো অনেক দিয়ে যেতে পারতেন। এশিয়াটিক সোসাইটিতে বিদ্যাচর্চার বহু বিষয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন বারবার – ভাষাবিজ্ঞানে তো বটেই। শিক্ষাজীবনে কৈশোরের বেশ খানিকটা সময় কেটেছে আমেরিকাতে। সংস্কৃত কলেজে স্নাতক স্তরে, স্নাতকোত্তরে আবার আমেরিকা। অধ্যাপনার খানিকটা সময় পুনে, তারপর হায়দরাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, অবসর গ্রহণের আগে আইএসআই কলকাতাতে। কর্মজীবনের শুরুতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন ছিলেন। ১৮ বছর বয়সে ভাষাবিজ্ঞানে অনুপ্রবেশ ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে, এছাড়া দর্শনতত্ত্বে, সাহিত্যে, সামাজিক আন্দোলনে নতুন ভাবনায় তাঁর অবদান রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তাঁর আদান-প্রদান একটা নিজস্ব ঘরানা গড়ে তুলেছিল। ভাষাবিজ্ঞান এবং এস্পেরেন্তো ভাষায় তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কারণে বাংলার বৈদগ্ধ্যের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বিশ্বের বহু দেশ থেকে প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

প্রবাল দাশগুপ্ত (১৯৫৩-২০২৬)

ইংরেজি, বাংলা এবং এস্পেরেন্তোতে তাঁর বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রয়েছে। তবে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। সেটির সঙ্গে অনেকের পরিচিতি তেমন করে ঘটেনি। এমনকি ভাষাবিজ্ঞানে যাঁদের অনুপ্রবেশ রয়েছে তাঁদেরও। সেটি একাধারে ভাষাবিজ্ঞানে যেমন অভিনবত্ব রেখেছে, তেমনি দর্শনের চর্চার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বা নিতে পারে। চমস্কির পরে ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর তাত্ত্বিক ভিত্তি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। তাঁর 'সাবস্ট্যান্টিভিজ্‌ম'-এর তত্ত্ব যাকে তিনি নিজে 'কায়াবাদ' বলেছেন সেই ব্যাপারটিতে তিনি একক ব্যক্তিত্ব, যদিও কাজটি করেছেন রাজেন্দ্র সিং এবং আরও একজনের সঙ্গে যুক্ত ভাবে। এ নিয়ে বহু রচনা রয়েছে। শুধু তাই নয় এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি পরবর্তীকালে বহু

রচনাতে ও গবেষণায় এই ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণ, ব্যুৎপত্তিবাদ ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ছাড়িয়ে সোস্যুরের গঠনবাদ, অর্থাৎ আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের শুরু। এরপর চমস্কি, তারপরে 'পরিগণকী ভাষাতত্ত্ব' (computational linguistics) এসবের প্রভাব অতি দ্রুত এসে পড়ার ফলে, অধ্যাপক দাশগুপ্তের ভাবনাটি তেমন করে পঠনপাঠনের জগতে ঠাঁই করতে পারেনি। যে কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তি অনুসারে ভাষা-বিশ্লেষণে দক্ষতা অর্জন করতে একটা সময় লাগে। ভারতীয় ঐতিহ্যবাদী ব্যাকরণ দিয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষাকে বিশ্লেষণ করতেই একটা অধ্যায় চলে গেছে। তারপরে সোস্যুর ও তাঁর বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান। এর দু-তিন দশকের মধ্যেই এলান টুরিং ও কম্পিউটার, যাকে পরিগণক বলেছি। ১৯১৬ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যেই চমস্কির 'সঞ্জননী সংবর্তনী ভাষাতত্ত্ব' আর পরিগণক দিয়ে ভাষাবিশ্লেষণ এসে ভাষাবিজ্ঞানের গবেষকদেরকে তাত্ত্বিক বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। সঞ্জননীতত্ত্বের ক্রমাগত বিকাশ, অন্যদিকে পরিগণকী প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন ভাষাতত্ত্বে নতুন নতুন আবেদন রেখেছে। দুটিরই আবেদন ছিল সবচেয়ে বেশি, যা এখনো অস্থির রেখেছে ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের। এরই মাঝে প্রবাল দাশগুপ্তের কায়াবাদ পিছনে পড়ে গিয়েছে। স্মৃতিতর্পণে তারই দু-একটি কথা রয়েছে এখানে।

গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে comparative philology এবং ব্যুৎপত্তিবাদ, এবং সোস্যুরের descriptive linguistics এবং গঠনবাদ (structuralist) আমাদের দেশে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে জাঁকিয়ে বসেছিল। ষাটের দশকের শেষ ভাগ থেকে সমাজ-ভাষাবিজ্ঞান ভাষার কাঠামোতে সমাজ কীভাবে বাসা বাঁধে সেই ব্যাপারটা সামনে নিয়ে এলো। সেটি এসেছিল চমস্কির linguistic competence-এর বিপরীতে ডেলহাইমসের communicative competence-এর মতবাদকে আশ্রয় করে। এই ব্যাপারগুলো প্রবাল দাশগুপ্তের কায়াবাদে একটা ভিন্ন বিষয় হিসেবে উঠে এলো। ভাষাকে বিচার করে দেখতে গেলে কেবল বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, একই সঙ্গে চমস্কির মডেল স্পিকারের ভাষার বিশ্লেষণ দিয়ে ধরা যাবে না। শব্দকে তার ব্যুৎপত্তি দিয়ে ভেঙ্গে ধাতু, বিভক্তি, প্রত্যয়, উপসর্গ বা আজকের নিয়মে বদ্ধ বা মুক্তরূপে উপস্থাপিত করলে, শব্দের content plane বা তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিশ্বটাকে ধরা যেতে পারে না। শব্দ তো ভাষাগোষ্ঠীর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকে। তার অর্থের জগৎ তৈরি হয়, একটি ভাষা সম্প্রদায়ের অতীত ও বর্তমান বহু কিছুকে মিশিয়ে। কিছু নিশানা শব্দের গায়েও থাকে, ওই ব্যুৎপত্তির গঠনগত উপকরণের মধ্যেও। সেও যখন শব্দ থেকে আলাদা হয়ে যায় তখন আর এসব পাওয়া যায় না। ব্যুৎপত্তিবাদের সংকট এখানে। ঠিক যেমন একটা বাক্য থেকে পদকে পৃথক করে আলোচনা করতে বসলে বাক্যের মধ্যেই তার কী অর্থ ছিল সেটি খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। অনুবাদের সময় ধরা পড়ে। যারা ব্যবহার করেছে বা যাদের ভাবনায় অনুশীলনে ব্যবহারিক রূপ পেয়েছে সেগুলোকে তো শব্দ দিয়ে ধরতে হবে। ব্যুৎপত্তি দিয়ে যেমন পাওয়া যাবে না তেমনি কেবল গঠন কাঠামোর বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ বা চমস্কির মডেল স্পিকারের মননের পথ ধরে সেগুলো পাওয়া যাবে না। তাদেরকে পেতে হলে ভিন্ন পথ অনুশীলন করতে হবে। দাশগুপ্তের ব্যাপারটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

চমস্কিয়ান আকরণবাদ mentalism / non-material view মনে করে ভাষা শুধু ধ্বনি বা অক্ষরের সমষ্টি নয়। এর মূল ভিত্তি মানুষের মন, চিন্তা ও মানসিক গঠন। ভাষার গভীরে যে একটা মানসিক কাঠামো আছে তার যে একটা প্রতিরূপ থাকে, অর্থ, ধারণা, ইত্যাদি ভাষা হল তারই প্রকাশ। 'গাছ' শব্দে মনে যে গাছের ধারণা বা মানসিক ছবি তৈরি হয়, আকরণবাদ সেই মানসিক দিকটিকে প্রধান বলে মনে করে। চমস্কিয়ান ভাবনা মনের এই অন্তর্নিহিত বিষয়কে নিয়ে চর্চা করছে, দাশগুপ্তেরা সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এঁদের চর্চা আলোচনা শুরু ভাষার বাহ্যিক যে প্রকাশ তাকে কেন্দ্র করে। মূল পার্থক্যটা এখানে। ভাষা হল একটি ভৌত (physical) ঘটনা। অর্থাৎ

ভাষাকে ধ্বনি, শব্দতরঙ্গ, লিখিত চিহ্ন, উচ্চারণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নড়াচড়া ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়। মানুষের শারীরিক আচরণে ভাষার প্রকাশ। প্রকাশের যে দৃশ্যমান ও শ্রাব্য ধ্বনি রূপ সেগুলি প্রাথমিক উপাদান হিসেবে ঠাঁই পেয়েছে। 'গাছ' শব্দটি উচ্চারণের সময় যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় বা লিখলে যে লিপির সমাহার দেখা যায়—কায়াবাদ ভাষার ওই দুই ভৌত রূপের উপর জোর দেয়।

দাশগুপ্তের যুক্তির আয়নায় সোস্যুরের ভাবনাও খানিকটা আকরণবাদের মধ্যে পড়ে। তাঁর ধ্বনিচিত্রও সরাসরি যে ভৌত ধ্বনি নয় এটি স্পষ্ট। এটি বক্তার মনে থাকা ধ্বনির মানসিক প্রতিরূপ। অর্থাৎ ভাষাকে কেবল বাহ্যিক শব্দ বা ভৌত ঘটনা হিসেবে তিনি দেখেননি, বরং একটি মানসিক ও সামাজিক চিহ্নব্যবস্থা হিসেবে দেখেছেন। তাঁর চিহ্নক (signifier) ও চিহ্নিত (signified) হল মন ও সমাজের সমান্তরাল রূপ। তিনি মূলত গঠনবাদী structuralist, তবে তার মধ্যে আকরণবাদও আছে। ভাষাকে ধারণার চিহ্নের সমাহার হিসেবে নির্বাচন করার ফলে মানসিক দিকটি আকরণবাদী প্রবণতার নিকটবর্তী। তবে সাধারণভাবে তাঁর পরিচয় গঠনবাদী ভাষাতাত্ত্বিক।

Substantivism-এ ভাষা কেবল নিয়মে গড়ে ওঠা কাঠামো (formal system) বা কেবল সামাজিক code নয়। মানুষের বাস রয়েছে ভাষার মধ্যে। ভাষাকে সাংস্কৃতিক বাস্তবতার অংশ হিসেবে দেখতে চাওয়া হয়েছে এখানে। substantivism বা কায়াবাদে substance এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। কারণ এর মধ্যে রয়েছে বাস্তবের জীবন্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও শব্দগত উপাদান। দুটো মাধ্যমের যে ভৌত উপাদানের কথা বলা হল, সেগুলি কেবল লিপি বা ধ্বনি নয়, আবার মানসিক ব্যাকরণও নয়। একটি মৌলিক বাস্তবতার পরিণতি। এর মধ্যে রয়েছে ভাষাভাষীর বাস্তব অভিজ্ঞতা। এর মধ্যেই বাস করে তাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চিত্র। এরই মধ্যে রয়েছে ব্যাকরণ, রয়েছে অভিধানের নানা উপাদানও। ভাষাবিজ্ঞানীর কাছে তাই ভাষা কেবল একটি বস্তুগত উপাদান নয় বা নিয়মের ফসল নয়, সমাজের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের উপাদানেও সমৃদ্ধ। উপাদানগুলো এসবের সঙ্গেই নিত্য সম্বন্ধে আবর্তিত হতে হতেই একটা রূপ পেয়েছে। তাই দাশগুপ্তের ভাষা দর্শনের মধ্যে চমস্কি বা সোস্যুরকে, বা ঐতিহ্যবাহী ব্যাকরণকে পাওয়া যাবে না তা নয়, তাঁদের কাছে তিনি ঋণী, তবে তাঁর কায়াবাদ সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়বস্তু বা substance নিঃসন্দেহে তৃতীয় একটি অবস্থানের দিকে ইঙ্গিত করে যার মধ্যে সমাজভাষাবিজ্ঞানের উপাদানও একাকার হয়ে আছে।

এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ রয়েছে, মতামতের ভিন্নতা রয়েছে। এখানেও একটি ব্যক্তিগত উপলব্ধির কথাই বলা হলো, সমালোচনার নয়। ভাষাবিজ্ঞানীরা বা ভাষাবিজ্ঞানের গবেষকেরা আরো বিস্তৃতভাবে প্রফেসর দাশগুপ্তের অবদান নিয়ে আলোচনা করবেন। তাতে ভাষাবিজ্ঞান সমৃদ্ধ হবে। স্মৃতিতর্পণ যথাযথ হবে। বৈদগ্ধের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। দাশগুপ্ত তাঁর নিজস্ব রীতিতেই যেমন ভাষা বিজ্ঞানের একটি ঘরানা তৈরি করেছিলেন, তেমনি বাংলা ভাষাচর্চার ক্ষেত্রেও তার শব্দবিন্যাস, বাক্যের কাঠামো ছিল একটি পৃথক রীতির। সেখানেও এই দার্শনিক তত্ত্বের ছায়া রয়েছে। তিনি ভাষা ব্যবহারকারীদের সঙ্গে কথা বলে তত্ত্বের দিকে এগনো ঠিক মনে করতেন, অন্যেরা যখন তত্ত্ব দিয়ে ভাষা ব্যবহারকারীর কাছে যেতে অভ্যস্ত। ভাষাবিজ্ঞানীরা তো বটেই, সাহিত্য, দর্শন, তুলনামূলক সাহিত্য, ব্যাকরণ নিয়ে যাঁরা চর্চা করেছেন তাঁরাও প্রবাল দাশগুপ্তের কাছে খানিকটা ঋণী। এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাচর্চার কর্মযজ্ঞেও এই কালান্তরের কালে তাঁর অন্তর্ধান নিশ্চয়ই একটা শূন্যতা তৈরি করবে।

বাংলার মন্দির-টেরাকোটায় প্রথামুক্ত দেবীমূর্তি: ইটন্ডার এক অনন্য রূপকল্পের বিশ্লেষণ

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়
সদস্য, দি এশিয়াটিক সোসাইটি

১. ভূমিকা ও পটভূমি

বাংলার মধ্যযুগীয় ও উত্তর-মধ্যযুগীয় মন্দির স্থাপত্য এবং তার গায়ে খোদিত টেরাকোটা বা পোড়ামাটির ভাস্কর্য কেবল ইটের কাঠামোর ওপর কাদামাটির প্রলেপ বা নিছক অলঙ্করণ নয়; তা সমকালীন সমাজজীবন, ধর্মভাবনা, লৌকিক বিশ্বাস এবং নামহীন লোকশিল্পীদের অবাধ কল্পনাশক্তির এক জিবন্ত ও ঐতিহাসিক দলিল। সাধারণত, বাংলার মন্দিরগাত্রের অলঙ্করণে এক ধরনের শাস্ত্রীয় অনুশাসন বা প্রথাগত ব্যাকরণ মেনে চলতে দেখা যায়। রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণের চেনা আখ্যানগুলি সূত্রধর বা ভাস্কররা অত্যন্ত ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনেই ফলকগুলিতে ফুটিয়ে তুলতেন। বিশেষ করে, আশ্বিন বা চৈত্র মাসের দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে দেবী দুর্গার যে 'মহিষাসুরমর্দিনী' রূপটি জনমানসে এবং শিল্পকলায় সর্বাধিক জনপ্রিয়, তার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ধ্রুপদী রূপকল্পই সর্বত্র প্রচলিত। সেখানে দেবী দশভুজা, তাঁর পদতলে মহিষের ছিন্ন মস্তক এবং সেই মহিষের ধড় থেকে নির্গত অসুরকে দেবী ত্রিশূল দিয়ে বিদ্ধ করছেন— এই চিরাচরিত দৃশ্যটিই বাংলার মন্দিরে মন্দিরে পুনরাবৃত্ত হতে দেখা যায়।

দ্বিভুজাদেবী অসুর নিধনরত। তাঁর এক হাতে মুগুরের ন্যায় অস্ত্র, অপর হাতে অসুরের জিব টেনে ধরেছেন। দেবীর বাহন সিংহ অসুরের ডান হাত কামড়ে ধরেছে। পরিত্যক্ত জোড়বাংলা কালী মন্দির, ইটন্ডা, বীরভূম (অষ্টাদশশতক)।

কিন্তু এই প্রথাগত ব্যাকরণ, শাস্ত্রীয় অনুশাসন এবং ধ্রুপদী মূর্তিতত্ত্বের গণ্ডিকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে এক অভাবনীয়, সাহসী এবং অভূতপূর্ব রূপকল্পের সন্ধান মেলে বীরভূম জেলার বোলপুরের নিকটবর্তী ইটন্ডা গ্রামের একটি পরিত্যক্ত জোড়বাংলা মন্দিরের গায়ে। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে বা উনবিংশ শতকের সূচনালগ্নে নির্মিত এই মন্দিরের একটি আয়তাকার পোড়ামাটির প্যানেলে স্থান পেয়েছে এমন এক দেবীমূর্তি, যা দর্শনার্থী ও গবেষকদের প্রচলিত ধারণাকে এক লহমায় ধাক্কা দেয়।

এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো, ইটন্ডা ও জোড়বাংলা মন্দিরের এই প্রথামুক্ত দেবী-ফলকটির শৈল্পিক গঠনশৈলী এবং তার আইকোনোগ্রাফিক ব্যতিক্রমী চরিত্রটিকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা। একই সাথে, ধ্রুপদী মহিষাসুরমর্দিনী রূপের সাথে এর মূর্তিতাত্ত্বিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি আলোচনা করে, কীভাবে তান্ত্রিক বগলামুখী তত্ত্ব এবং বাংলার লোকায়ত 'জিব টেনে নেওয়া'-এর মতো শাস্তির লৌকিক ধারণা এই ফলকে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, তার একটি গভীর নন্দনতাত্ত্বিক ও সামাজিক পাঠ প্রস্তুত করা।

২. ফলকটির মূর্তিতাত্ত্বিক বিবরণ

ইটন্ডার এই পোড়ামাটির ফলকটির সামনে দাঁড়ালে প্রথমেই যে বিষয়টি চোখ টানে, তা হলো এর অভাবনীয় গঠনশৈলী এবং প্রতিটি চরিত্রের শারীরিক ভাষা। শিল্পী এখানে মাটির ওপর তুলির টানের মতো এমন কিছু সূক্ষ্ম মূর্তিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন, যা একাধারে বিস্ময়কর এবং রহস্যময়। আয়তাকার এই প্যানেলের কেন্দ্রে রয়েছেন দেবী। তিনি চিরাচরিত দুর্গা প্রতিমার মতো বহুভুজা বা দশভুজা নন, বরং সম্পূর্ণ 'দ্বিভুজা' বা দুটি হাত বিশিষ্ট। দেবীর এই শারীরিক সরলীকরণ মূর্তির ধ্রুপদী দূরত্বকে কমিয়ে তাকে অনেক বেশি লৌকিক এবং চাক্ষুষ করে তুলেছে। দেবীর দাঁড়ানোর ভঙ্গির মধ্যেও রয়েছে এক তীব্র যুদ্ধংদেহী ক্ষিপ্রতা— তাঁর ডান পাটি সগর্বে চেপে রয়েছে বাহন সিংহের পিঠের ওপর এবং বাম পাটি সোজা এসে চেপে ধরেছে অসুরের উরু বা জানু। এই বিপরীতমুখী পায়ের অবস্থান পুরো দৃশ্যটিতে একটি চমৎকার জ্যামিতিক ভারসাম্য এবং অপ্রতিরোধ্য শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছে।

এবার আসা যাক দেবীর অস্ত্রের ব্যবহারে। সাধারণ মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিতে দেবীর হাত জুড়ে খড়্গা, ত্রিশূল, চক্র বা ধনুর্বাণের যে রাজসিক আস্ফালন থাকে, এখানে তার লেশমাত্র নেই। দেবীর ডান হাতে উদ্যত রয়েছে একটি 'মুগুর' বা গদা, যা দিয়ে তিনি অসুরের মাথায় আঘাত করতে যাচ্ছেন। আর তাঁর বাম হাতটি সরাসরি অবতীর্ণ হয়েছে এক অভূতপূর্ব ভূমিকায়— তা সজোরে টেনে ধরেছে অসুরের জিব। মূর্তিতত্ত্বের ইতিহাসে এক হাতে মুগুর উঁচিয়ে অন্য হাতে শত্রুর জিব টেনে ধরার এই নির্দিষ্ট মুদ্রাটি কিন্তু দেবী দুর্গার নয়, বরং এটি দশমহাবিদ্যার অষ্টম রূপ দেবী বগলামুখীর একান্ত নিজস্ব 'বাক-স্তম্ভন' মুদ্রা (পীতবর্ণা, ত্রিনয়না, সিংহাসনে আসীন, বাহন সারস পাখি)। তান্ত্রিক সাধনায় শত্রুর বাগাড়ম্বর বা অনিষ্টকারী বাক্যকে স্তব্ধ করে দেওয়ার যে তত্ত্ব প্রচলিত, শিল্পী এখানে সেই তান্ত্রিক ভাবটিকে উপজিব্য করেছেন। অথচ, এই খাঁটি তান্ত্রিক মুদ্রার ঠিক নিচেই আবার জ্বলজ্বল করছে দেবীর পৌরাণিক বাহন সিংহ। দেবীর এই সিংহটি আবার নিছক দর্শক নয়, সে সজোরে কামড়ে ধরেছে অসুরের ডান হাত, যার ফলে অসুর সম্পূর্ণ পঙ্গু ও অকেজো হয়ে পড়েছে। তান্ত্রিক বগলামুখী রূপের সঙ্গে পৌরাণিক সিংহবাহিনীর এই কোলাজ বা মিশ্রণ টেরাকোটা শিল্পের এক পরম আশ্চর্য সৃষ্টি।

তবে ফলকটির সবচেয়ে চমকপ্রদ এবং সাহসী নন্দনতাত্ত্বিক দিকটি লুকিয়ে রয়েছে অসুরের রূপকল্পে। এখানে অসুর কোনো দানবীয়, শিং-যুক্ত বা পশুবৎ অবয়ব নিয়ে হাজির হয়নি; সে সম্পূর্ণ এক সুস্থ-সবল, যোদ্ধা-সুলভ মানব রূপধারী। অসুরের বাম হাতে একটি

আত্মরক্ষার ঢাল থাকলেও দেবীর চণ্ডী রূপ এবং সিংহের আক্রমণের সামনে সে চরম অসহায়। কিন্তু সবচেয়ে ভাববার বিষয় হলো অসুরের শরীরে খোদিত সমকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতীকগুলি। অসুরের ঊর্ধ্বাংশ অনাবৃত, কিন্তু তার বুকে ও কাঁধে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে একটি 'উপবীত' বা পৈতা। শুধু তাই নয়, তার কপালে খুব যত্ন সহকারে খোদাই করা রয়েছে তিনটি আনুভূমিক বা চওড়া তিলকের রেখা।

৩. প্রথাগত মহিষাসুরমর্দিনীর সঙ্গে তুলনা

বাংলার গ্রামীণ সূত্রধররা যখন মন্দিরের দেওয়ালে মাত্র ফলক গড়তেন, তখন তাঁদের সামনে থাকত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা দুর্গা প্রতিমার এক চিরচেনা ধ্রুপদী রূপ। কিন্তু ইটের এই ফলকটি নিয়ে বসার সময় শিল্পী যেন সচেতনভাবেই সেই চেনা ব্যাকরণ থেকে একটু সরে যেতে চেয়েছিলেন। তাই প্রথাগত মহিষাসুরমর্দিনীর সঙ্গে এই মূর্তির তুলনা করতে বসলে এর মিল আর অমিলের এক দারুণ খেলা চোখে পড়ে।

প্রথমে অমিল বা বৈসাদৃশ্যগুলির কথাই ধরা যাক। আমাদের মনে দুর্গা বা মহিষাসুরমর্দিনীর যে ছবিটা সবচেয়ে প্রথমে ভেসে ওঠে, তা হলো দেবীর দশটি হাত, যা চারদিকের আকাশকে ছুঁয়ে রয়েছে। কিন্তু এই ফলকে দেবী মাত্র দুটি হাত নিয়ে দাঁড়িয়ে। দশ হাতের সেই মহাকাব্যিক গাম্ভীর্যের বদলে এখানে মাত্র দুই হাতের ব্যবহারে এক ধরণের লৌকিক, চাক্ষুষ এবং অত্যন্ত মুখোমুখি সংঘাতের আবহ তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয় বড় অমিলটি লুকিয়ে রয়েছে স্বয়ং 'মহিষাসুর' শব্দটার মধ্যেই। নামটাই যেখানে মহিষকে কেন্দ্র করে, সেখানে এই পুরো ফলকটিতে মহিষের কোনো চিহ্ন বা লেশমাত্র নেই। প্রথাগত মূর্তিতে আমরা দেখি মহিষের কাটা গলা থেকে অসুরের জন্ম হচ্ছে, কিন্তু এখানে অসুর সরাসরি একজন মানুষের রূপ নিয়ে দেবীর সামনে হাজির। শুধু তাই নয়, দেবীর হাতের অস্ত্রও বদলে গেছে সম্পূর্ণ। মহিষাসুরমর্দিনীর প্রধান অস্ত্র যেখানে ত্রিশূল বা খড়্গ, এখানে সেখানে ঠাঁই পেয়েছে একটি ভারী মুগুর বা গদা। অপর হাত দিয়ে দেবী সরাসরি অসুরের জিব টেনে ধরেছেন।

তবে এত সব অমিল আর প্রথামুক্ত ছকের মধ্যেও শিল্পী কিন্তু মহিষাসুরমর্দিনীর মূল ভাবটিকে একেবারে হারিয়ে যেতে দেননি, আর এখানেই লুকিয়ে রয়েছে এর মিল বা সাদৃশ্যটুকু। ফলকটিতে মহিষ না থাকলেও, দেবীর চিরন্তন বাহন 'সিংহ' কিন্তু সগর্বে উপস্থিত। শুধু উপস্থিতই নয়, প্রথাগত দুর্গা প্রতিমার মতোই সেই সিংহ এখানে অসুরের হাত কামড়ে ধরে দেবীমূর্তির রণচণ্ডী ভাবটিকে পুরোপুরি সার্থক করে তুলেছে। আরও একটি বড় মিল হলো দেবীর দাঁড়ানোর ভঙ্গি। মহিষাসুরমর্দিনী যেভাবে এক পা সিংহের পিঠে এবং অন্য পা অসুরের বুকে চেপে ধরে এক অপ্রতিরোধ্য 'ত্রিকোণ' জ্যামিতিক ভারসাম্য তৈরি করেন, এখানেও ঠিক সেই একই ভঙ্গিতে দেবীর এক পা সিংহের ওপর এবং অন্য পা অসুরের জানুর ওপর চেপে বসেছে। অস্ত্রের হেরফের হতে পারে, হাতের সংখ্যা কমতে পারে, কিন্তু অশুভ শক্তির দর্পচূর্ণ করার যে আদি ও অকৃত্রিম 'বীররস'— তা এই ফলকটিতেও মহিষাসুরমর্দিনীর মতোই সমানভাবে প্রদীপ্ত।

৪. তান্ত্রিক বগলামুখী তন্ত্রের সংযোগ ও নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইটন্ডার এই ফলকটিকে যখন আমরা নিছক একটা লৌকিক চিত্র হিসেবে না দেখে তার গভীরে ঢোকার চেষ্টা করি, তখন তার মধ্যে এক আশ্চর্য তান্ত্রিক দর্শনের ছোঁয়া পাওয়া যায়। দেবী দুর্গার রূপকল্পে এই যে হঠাৎ করে মহিষ উধাও হয়ে গেল, হাতের অস্ত্র বদলে গেল, আর দেবী এক হাতে মুগুর উঁচিয়ে অন্য হাত দিয়ে অসুরের জিব টেনে ধরলেন— এই পুরো দৃশ্যটা কিন্তু সনাতন শাস্ত্রের অত্যন্ত গুহ্য এক সাধনার কথা মনে

করিয়ে দেয়। তান্ত্রিক ধারায় দশমহাবিদ্যার অষ্টম রূপ হলেন দেবী বগলামুখী, যাকে 'পীতাম্বরা' বা 'স্তম্ভনকারিণী' বলা হয়। বগলামুখীর ধ্যানমন্ত্রের মূল নির্যাসই হলো— দেবী তাঁর এক হাতে মুগুর বা গদা নিয়ে শত্রুকে আঘাত করছেন এবং অন্য হাত দিয়ে তার জিব টেনে ধরেছেন। তন্ত্রে একে বলা হয় 'বাক-স্তম্ভন' বা 'জিহ্বা-কীলন'। অর্থাৎ, শত্রু যাতে সাধকের বা সমাজের কোনো ক্ষতি করতে না পারে, তার জন্য তার কথা বলার শক্তি, তার কুচক্রী বুদ্ধি এবং তার গতিকে জাদুকরী উপায়ে অবশ বা স্তব্ধ করে দেওয়া। ইটন্ডার গ্রামীণ শিল্পী অবলীলায় ধ্রুপদী মহিষাসুরমর্দিনীর কাঠামোর ভেতরে এই খাঁটি তান্ত্রিক বগলামুখী রূপের সংযোগ ঘটিয়েছেন।

নন্দনতাত্ত্বিক (Aesthetic) দৃষ্টিকোণ থেকে এই রূপান্তরটি অত্যন্ত চমৎকার এবং বুদ্ধিদীপ্ত। প্রথাগত দুর্গা প্রতিমায় অসুরের বুক চিরে রক্তপাত ঘটানোর মাধ্যমে যে 'রৌদ্র রস' বা সংহারের ভাব প্রকাশ পায়, এই ফলকে কিন্তু সেই রক্তপাতের দৃশ্য নেই। এখানে সংহারের চেয়ে 'স্তম্ভন' বা অবশ করে দেওয়ার ভাবটিই প্রধান। দেবীর বাম হাতটি যখন অসুরের জিব সজোরে টেনে ধরেছে, তখন অসুরের সমস্ত অহংকার, আস্ফালন এবং চিংকার যেন এক মুহূর্তের মধ্যে হিম হয়ে গেছে। শিল্পী এখানে মাটির ফলকে শারীরিক সহিংসতার চেয়ে মনস্তাত্ত্বিক দমনকে বেশি ফুটিয়ে তুলেছেন, যা এই প্যানেলে এক অনন্য ভয়ানক ও অদ্ভুতরসের জন্ম দিয়েছে।

একই সঙ্গে, এই জিব টেনে ধরার মুদ্রার মধ্যে এক ধরণের লৌকিক ও সামাজিক নন্দনতত্ত্বও জড়িয়ে রয়েছে। বাংলার গ্রামীণ সমাজে বা লোকালয়ে কোনো চোর, মিথ্যাবাদী বা অন্যায়কারী ধরা পড়লে তার 'জিব টেনে নেওয়া' বা 'মুখ বন্ধ করে দেওয়া'র মতো শাস্তির কথা অত্যন্ত চেনা। গ্রামীণ সূত্রধর হয়তো শাস্ত্রের জটিল তান্ত্রিক দর্শনকে সাধারণ মানুষের চেনা লৌকিক শাস্তির মোড়কে পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন। দেবীর হাতের মুগুর এবং অসুরের জিব টেনে ধরার এই টানটান জ্যামিতিক বিন্যাস, এই ফলকটির মধ্যে এক অপুর্ব দৃশ্যগত ভারসাম্য (Visual Balance) তৈরি করেছে। তাত্ত্বিকভাবে যা ছিল অতিপ্রাকৃতিক এবং গোপন তান্ত্রিক সাধন প্রণালী, বাংলার লোকশিল্পীর হাতের জাদুতে তা মন্দিরের দেওয়ালে এসে সর্বসাধারণের বোধগম্য এক শাশ্বত নৈতিক বিজয়গাথা হয়ে উঠেছে।

৫. লৌকিক প্রভাব ও রসাভাস

ইটন্ডার এই ফলকটির দিকে তাকালে সমাজতাত্ত্বিক ও নান্দনিক দিক থেকে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তোলে, তা হলো এর লৌকিক প্রেক্ষাপট এবং রসের বহুমাত্রিক ব্যবহার। সাধারণ মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিতে আমরা যে রণক্ষেত্রের ভয়াবহতা বা স্বর্গীয় যুদ্ধের আবহ দেখি, এখানে শিল্পী তার খোলসটি পুরোপুরি বদলে দিয়েছেন। এখানে অসুরের 'জিব টেনে ধরা'-র যে কেন্দ্রীয় মুদ্রা, তা আসলে কোনো উচ্চমার্গীয় পৌরাণিক যুদ্ধের অঙ্গ নয়; তা বাংলার গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার অতি পরিচিত এক লৌকিক শাস্তির দৃশ্য। আবহমান কাল ধরে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে চোর, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী বা পরনিন্দাকারীর মতো অপরাধীদের জনসমক্ষে যে সামাজিক নিগ্রহ বা শাস্তি দেওয়া হতো, তার চাক্ষুষ রূপটিই ছিল এই জিব টেনে ধরা বা মুখ বন্ধ করে দেওয়া। গ্রামীণ সূত্রধর খুব সচেতনভাবেই স্বর্গলোকের এক দেবীকে মর্ত্যের গ্রামীণ সালিশি সভার সেই চেনা বিচারকের ভূমিকায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। এর ফলে উচ্চমার্গীয় ধর্মতত্ত্ব এক লহমায় সাধারণ মানুষের ঘরের অত্যন্ত চেনা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়েছে।

এই লৌকিক শাস্তির দৃশ্যটিকে সার্থক করতে শিল্পী ফলকটির অবয়বে রসাভাসের (Aesthetic Sentiments) এক অপূর্ব জ্যামিতিক ভারসাম্য (Geometric Balance)

তৈরি করেছেন। একদিকে দেবী এবং তাঁর বাহন সিংহ— যাঁরা মিলিতভাবে 'রৌদ্র' ও 'বীর' রসের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। দেবীর এক পা সিংহের ওপর ও অন্য পা অসুরের জানুর ওপর রেখে যে যোদ্ধার মতো ভঙ্গি তৈরি হয়েছে, তা দৃশ্যের ভেতরের তীব্র গতিশীলতা ও ক্রোধকে ফুটিয়ে তোলে। দেবীর উঁচিয়ে ধরা মুগুর এবং অসুরের জিহ্বার ওপর তাঁর বাম হাতের মুঠো— এই দুটি সমান্তরাল রেখা ফলকটির ওপরের অংশে এক ধরণের অপ্রতিরোধ্য শক্তির দাপট বা রৌদ্র রসকে ধরে রেখেছে।

কিন্তু ঠিক এর বিপরীতে, দেবীর এই প্রকাণ্ড শক্তির সামনে অসুরকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা ফলকটির নিচের অংশে এক গভীর 'করুণ রস' এবং 'ভয়ানক রসে'-র জন্ম দেয়। অসুরের শরীরী ভাষা এখানে লক্ষ করার মতো। সে পশুবৎ বা দানবীয় অবয়বহীন এক অসহায় মানুষ। তার এক হাত দেবীর সিংহের মুখে বন্দি, অন্য হাতটি ঢালসহ ভেঙে পড়েছে, আর তার নিজের জিহ্বাটি দেবীর হাতের টানে মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। অসুরের মুখের এই যন্ত্রণাক্লিষ্ট ও লাঞ্ছিত অভিব্যক্তি এবং তার অবলীলাক্রমে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ার ভঙ্গিটি দর্শককে এক লহমায় করুণ রসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

নন্দনতত্ত্বের নিয়ম অনুযায়ী, একই ফ্রেমে রৌদ্র ও করুণ রসের এই সহাবস্থান এক আশ্চর্য জ্যামিতিক ভারসাম্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। দেবীর ঋজু, দণ্ডায়মান ও আক্রমণাত্মক ভঙ্গি যদি এই জ্যামিতির ঊর্ধ্বমুখী বাহু হয়, তবে অসুরের নুয়ে পড়া, হাঁটু গেড়ে বসা ভঙ্গিটি হলো তার নিম্নমুখী সমান্তরাল রেখা। বাংলার নামহীন সূত্রধর মাটির এই ছোট্ট ফলকটিতে কেবল শক্তির জয় দেখাননি, বরং অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রেখে একদিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মহাজাগতিক ক্রোধ এবং অন্যদিকে সেই অন্যায়ের দর্পচূর্ণ হওয়ার পর অপরাধীর চরম অসহায়তা— এই দুই বিপরীতধর্মী রসকে একই সঙ্গে মিলিয়ে এক অনন্য দৃশ্যকাব্য তৈরি করেছেন।

৬. সামাজিক দর্পণ ও নৈতিক বার্তা

ইটভার এই অনন্য ফলকটি কেবলই একজন শিল্পীর নান্দনিক বিলাস বা নিছক একটি ধর্মীয় প্যানেল নয়; গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এটি আসলে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ এবং ঊনবিংশ শতকের সূচনালগ্নের বাংলার এক জিবন্ত 'সামাজিক দর্পণ'। তৎকালীন রাঢ় বাংলা, বিশেষ করে বীরভূম ও তার আশেপাশের অঞ্চলগুলি তখন এক চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। বর্গী হাঙ্গামা, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শোষণে বাংলার চেনা গ্রামীণ সমাজকাঠামো তখন তছনছ হয়ে গেছে। একদিকে রাজদণ্ডের ক্ষমতার দাপট, অন্যদিকে একশ্রেণীর নব্য বাবু, জোতদার ও উচ্চবর্ণের প্রভাবশালীদের ভণ্ডামি ও চরম সামাজিক অত্যাচার— সাধারণ মানুষের জিবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

এই চরম অস্থির সময়ে সমাজে কোনো নিয়মতান্ত্রিক বিচার বা সুশাসন ছিল না। ফলে শোষিত ও লাঞ্ছিত সাধারণ মানুষ মনের ভেতরের ক্ষোভ প্রকাশের জন্য কোনো এক অলৌকিক বা দৈব শক্তির জন্য আর্তি জানাচ্ছিল— যিনি এসে সমস্ত অন্যায়কারীর মুখ এক লহমায় বন্ধ করে দেবেন। গ্রামীণ লোকশিল্পী সমাজের এই চাপা হাহাকার এবং তীব্র আকুতিকেই মাটির ফলকে রূপ দিয়েছেন। দেবীর এই 'জিব টেনে ধরা' এবং 'মুগুর উঁচিয়ে' আঘাত করার ভঙ্গিটি আসলে সমাজের সেইসব অত্যাচারী ও কুচক্রী ক্ষমতাশালীদের 'অহংকার দমনের এক মহাশৈল্পিক রূপক'।

এই রূপকটি আরও বেশি স্পষ্ট ও জোরালো হয়ে ওঠে যখন আমরা অসুরের গায়ে খোদিত উচ্চবর্ণ ও সামাজিক ক্ষমতার প্রতীক— পৈতা এবং কপালে যত্ন করে আঁকা তিলকের রেখাগুলি দেখি।

শাস্ত্রে অসুরের এই রূপ কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু সমাজমনস্ক শিল্পী এখানে খুব সচেতনভাবেই পুরাণের দানবীয় অসুরের বদলে এক সমকালীন, সামাজিক অসুরকে চিহ্নিত করেছেন। কপালে তিলক আর বুকে পৈতা ঝোলানো এই চরিত্রটি আসলে সেইসব ভণ্ড, অহংকারী ও অত্যাচারী ভুঁইফোড় ক্ষমতাশালীদের প্রতীক, যারা ধর্মের ভেক ধরে বা ক্ষমতার দাপটে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার চালাত।

দেবী যখন এই পৈতাধারী, তিলকধারী অসুরের জিব টেনে ধরেন, তখন তা আর কেবল কোনো পৌরাণিক অসুরবধ থাকে না। তা হয়ে ওঠে এক চরম নৈতিক বার্তা— যেখানে স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে, ধর্মের দোহাই দিয়ে বা ক্ষমতার ঔদ্ধত্যে সমাজকে যারা কলুষিত করছে, প্রকৃতির মহাশক্তি বা লোকালয়ের সম্মিলিত প্রতিরোধ একদিন তাদের এই বাচালতা, অহংকার ও আস্ফালনকে এভাবেই স্তব্ধ করে দেবে। ইটন্ডার জোড়বাংলা মন্দিরের এই ছোট্ট ফলকটি তাই সমকালীন বাংলার রাজনৈতিক নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে লোকশিল্পীর এক নীরব কিন্তু অত্যন্ত তীব্র প্রতিবাদী ইস্তাহার।

৭. উপসংহার

সবশেষে বলা যায়, বীরভূমের ইটন্ডা গ্রামের পরিত্যক্ত জোড়বাংলা মন্দিরের দেওয়ালে অক্ষত থাকা এই দেবী-ফলকটি কেবল কোনো মাটির কাজ বা নিছক রূপকর্ম নয়; এটি আসলে সমকালীন অজ্ঞাত গ্রামীণ লোকশিল্পীদের অসীম সাহসিকতা এবং স্বকীয়তার এক জ্বলন্ত ও ঐতিহাসিক দলিল। ধ্রুপদী শাস্ত্র, নির্দিষ্ট প্রথাগত মূর্তিলক্ষণের কঠোর অনুশাসনকে তাঁরা যেভাবে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন, তা তাঁদের স্বাধীন শৈল্পিক চেতনারই জয়গান গায়। প্রামাণ্য প্রাচীন গ্রন্থের বর্ণনার দাসত্ব না করে, শিল্পীরা তাদের সৃজনশীল প্রতিভাকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং দেবী দুর্গার এক সম্পূর্ণ নতুন রূপকল্প নির্মাণ করেছেন।

এই ফলকটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, কীভাবে বাংলার নিজস্ব আঞ্চলিক লোকবিশ্বাস এবং লৌকিক সংস্কৃতি সর্বভারতীয় ধ্রুপদী পৌরাণিক আখ্যানকে ধীরে ধীরে নিজের মতো করে আপন রূপ দান করেছিল। মহিষাসুরমর্দিনীর মতো একটি মহাকাব্যিক আখ্যানকে মহিষহীন করে, দেবীর হাতে মুগুর ধরিয়ে এবং অসুরের জিব টেনে নেওয়ার মতো গ্রামীণ শাস্তির মোড়কে উপস্থাপন করে শিল্পী মহাশক্তিকে আক্ষরিক অর্থেই 'মাটির কাছাকাছি' (Earthy) বা লৌকিক স্তরে নামিয়ে এনেছেন। এখানে উচ্চমার্গীয় ধ্রুপদী ব্যাকরণ শেষ পর্যন্ত স্থানীয় লোকশিল্পের সহজ ও সাবলীল ভঙ্গির কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে। একই সাথে, শাস্ত্রীয় দুর্গার কাঠামোর ভেতরে তান্ত্রিক বগলামুখীর 'বাক-স্তম্ভন' তত্ত্বের যে দৃশ্যমান প্রয়োগ এখানে লক্ষ করা যায়, তা বাংলার ধর্মীয় সংস্কৃতির এক অপুর্ব সমন্বয়ী রূপকে তুলে ধরে।

ভবিষ্যতের গবেষণার ক্ষেত্রে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের এই অনন্য ফলকটির ঐতিহাসিক, শৈল্পিক এবং সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব অপারসীম। কারণ এটি কেবল মূর্তিতত্ত্বের বিবর্তন বা আইকনোগ্রাফিক ব্যতিক্রমকেই তুলে ধরে না, বরং সমকালীন বাংলার সামাজিক মনস্তত্ত্ব, নৈতিকতা এবং লোকজ নন্দনবোধের এক অকৃত্রিম দর্পণ বা 'সোশ্যাল রেকর্ড' হিসেবে কাজ করে। এই ধরণের প্রথামুক্ত ও লৌকিক শিল্পনিদর্শনগুলিকে সংরক্ষণ করা এবং এদের পেছনের সামাজিক-তান্ত্রিক ইতিহাসকে আরও গভীরভাবে আলোয় নিয়ে আসা বর্তমান কালের গবেষকদের কাছে এক বড় সুযোগ।

यहां सिर्फ शब्द नहीं, इंसान की पूरी अभिव्यक्ति को पढ़ा जा सकता है...यहां किताबें ही नहीं बोलतीं, कठपुतलियां, मुखौटे और दादी-नानी की कहानियां भी 'भाषा' सिखाती हैं

दादी-नानी की कहानियों से कठपुतली, नवरस तक... 'शब्द' की पूरी दुनिया समेटता है नेशनल लाइब्रेरी में बना 'म्यूजियम ऑफ वर्ड' संग्रहालय

बबीता माली
पत्रकार, दैनिक भास्कर

क्या गुस्से से तनी हुई भौंहें भी भाषा हैं? क्या आंखों की मुस्कान, कठपुतली का खेल, नृत्य की मुद्राएं और दादी-नानी की सुनाई कहानियां भी संवाद का माध्यम हैं? अगर जवाब 'हाँ' है, तो शब्द सिर्फ वह नहीं हैं जिन्हें हम बोलते या लिखते हैं। इंसान का हर भाव, हर संकेत और हर अभिव्यक्ति भी एक भाषा है। इसी विचार को हजारों साल की भारतीय भाषाई और सांस्कृतिक यात्रा के साथ साकार करता है कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में बना भारत का पहला 'म्यूजियम ऑफ वर्ड', जिसका उद्घाटन रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया।

क़रीब 2,000 वर्ग मीटर में फैले इस संग्रहालय का संचालन नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम (NCSM) करेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भारत की भाषाओं का संग्रह मात्र नहीं, बल्कि मानव अभिव्यक्ति के विकास की कहानी है।

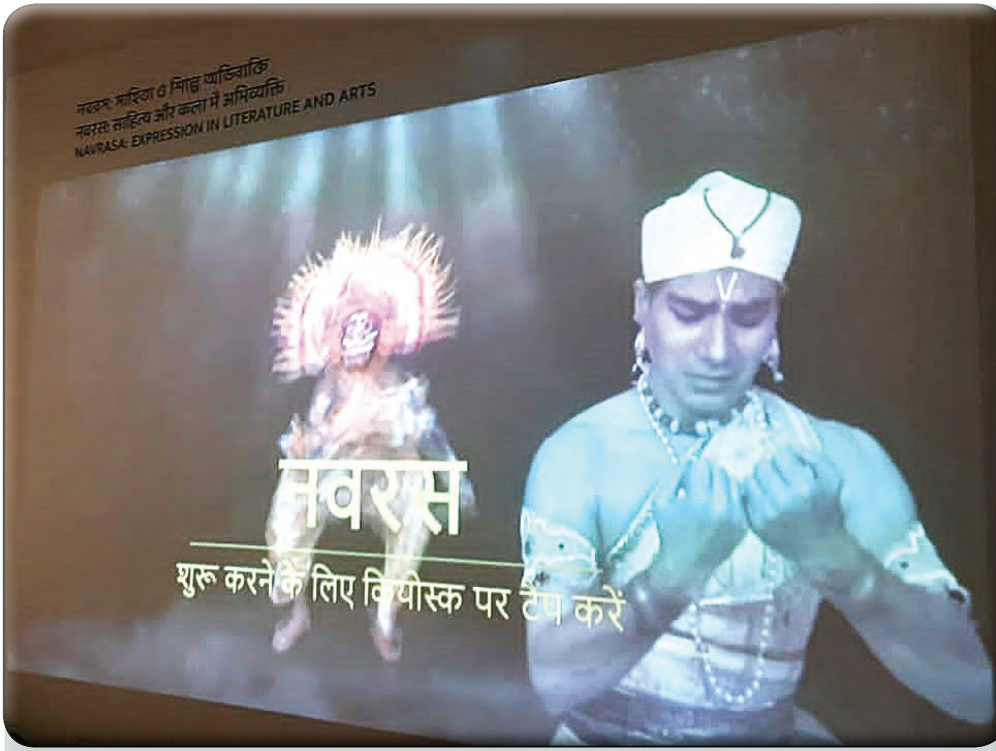

संकेत, नवरस और हाव-भाव भी है भाषा

"हम भाषा नहीं, भाषा के पीछे की मानव यात्रा दिखाना चाहते थे," एनसीएसएम के महानिदेशक के.एस. मुरली कहते हैं। उनके मुताबिक़, दुनिया में धार्मिक संदर्भों वाले 'म्यूजियम ऑफ वर्ड' मिल सकते हैं, लेकिन मानव सभ्यता में शब्द, भाषा और संचार के विकास को समर्पित इस तरह का संग्रहालय अपनी तरह का पहला प्रयास है। वे कहते हैं, "गुस्सा, मुस्कान, नृत्य, संकेत, नवरस और हाव-भाव भी भाषा हैं। कई बार इंसान बिना एक शब्द बोले अपनी पूरी बात कह देता है। संग्रहालय इसी व्यापक अर्थ में भाषा को देखने का प्रयास है। इस म्यूजियम को विकसित करने में द्रोणा कंसल्टेंसी की मदद ली गयी है।"

किताब नहीं, रिसर्च का जीवंत केंद्र

मुरली बताते हैं कि यह ऐसा संग्रहालय नहीं है जिसे देखकर लोग सिर्फ लौट जाएं। यहां आने वाला शोधकर्ता, छात्र या आम आगंतुक हर गैलरी को अध्ययन की तरह देख सकता है। अलग-अलग प्रदर्शों के बीच संबंध खोज सकता है, नए सुझाव दे सकता है और भविष्य में उपयोगी सुझावों को संग्रहालय का हिस्सा भी बनाया जा सकता है।

एआई अनुवाद करता है , लेकिन यह संग्रहालय भाषा की जड़ें बताएगा

चैटजीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में भी इस संग्रहालय की जरूरत पर मुरली कहते हैं कि" एआई भाषाओं का अनुवाद कर सकता है, लेकिन यह संग्रहालय बताता है कि एआई से बहुत पहले इंसान संवाद करना कैसे सीखता गया। भारतीय भाषाएं कैसे विकसित हुईं और संचार की संस्कृति किन पड़ावों से होकर गुजरी। "वे कहते हैं कि भविष्य में एआई का इस्तेमाल संग्रहालय को और बेहतर बनाने में किया जाएगा, लेकिन संग्रहालय का मूल उद्देश्य भाषा के इतिहास, विकास और उसकी सांस्कृतिक यात्रा को समझाना है।

हर उम्र के लोगों के लिए इंटरैक्टिव अनुभव

क़रीब 2,000 वर्ग मीटर में बने इस संग्रहालय में टचस्क्रीन, ऑडियो-विजुअल इंस्टॉलेशन और इंटरैक्टिव डिस्प्ले लगाए गए हैं। बच्चे, विद्यार्थी, शोधकर्ता और विदेशी पर्यटक सभी अपनी रुचि के अनुसार यहां जानकारी हासिल कर सकेंगे। संग्रहालय में प्रशिक्षित एक्सप्लेनर, वालंटियर और भाषाविज्ञान के विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे।

तीन चरणों में तैयार होगा पूरा प्रोजेक्ट

मुरली के अनुसार अभी फेज-1 पूरा हुआ है। फेज-2 में कैफे और सॉवेनियर शॉप बनाई जाएगी, जबकि फेज-3 में हेरिटेज इमारत पर प्रोजेक्शन मैपिंग और लाइट-एंड-साउंड शो विकसित किया जाएगा। पहले चरण की परियोजना पर क़रीब 15 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। पूरी परियोजना की अनुमानित लागत क़रीब 41 करोड़ रुपये है। फेज 2 और फेज 3 बनने में लगभग तीन वर्ष लगेंगे।

लिखित शब्द बाद में आया, भाषा पहले बोली और सुनी जाती थी

'म्यूजियम ऑफ वर्ड' की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां भाषा को सिर्फ लिखित शब्दों तक सीमित नहीं रखा गया है। द्रोणा कंसल्टेंसी की कंसल्टेंट दीक्षा बताती हैं कि नेशनल लाइब्रेरी और एशियाटिक सोसाइटी के रेयर आर्काइव में सुरक्षित कई दुर्लभ पांडुलिपियां पहली बार आम लोगों के सामने लाई गई हैं। इनमें तमिल की 'कंबर रामायण' भी शामिल है। तो वहीं एशियाटिक सोसाइटी से हितोपदेश, इंशा-ए-ग़ालिब, पृथ्वीराज रासौ की दुर्लभ पांडुलिपियाँ रखी गयी है लेकिन संग्रहालय की असली ताकत इसकी ओरल ट्रेडिशन गैलरी है। यहां दादी-नानी की कहानियां, लोककथाएं, कठपुतली, पटचित्र और लोककलाओं के जरिए बताया गया है कि लिखित शब्द बहुत बाद में आया, भाषा पहले बोली, सुनी और पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ी। दीक्षा कहती हैं, "भाषा सिर्फ लिखी नहीं जाती, वह बोली, गाई, सुनाई और जी भी जाती है। यही विचार इस संग्रहालय को भारत की भाषाई और सांस्कृतिक स्मृति का जीवंत संग्रहालय बनाता है।"

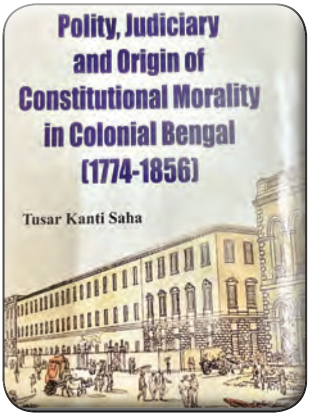

Polity, Judiciary and Origin of Constitutional Morality in Colonial Bengal (1774-1856)

Tusar Kanti Saha
Publisher : Abhijeet Publication, New Delhi.
ISBN. : 978-93-88865-82-1
Pages : 176
Price : 750/-

This endeavour reflects how intellectual ideas were evolved in Bengal in the nineteenth century obviously under the influence of the western thoughts. The theme of the said study is to critically analyse the constitutional morality through the intellectual lineage of democracy in the colonial Bengal. After the Battle of Plassey 1757 CE the colonial power was trying to grip the completely unknown land for their own sake. With the advent of colonial power there were several aspects emerged namely—liberal thoughts, western education emergence of educated middle class in Bengal, origin of press and political associations. In the mid-nineteenth century new intellectual format was gradually going to take a new shape.

In his dissertation, the subject is divided into four chapters such as—Orientalism and Constitutionalism; Rammohun Roy and Constitutionalism; Bengal Natives and Consent-Dissent Morality; Morality of Derozians : from the perspective of political and judicial agitation. Apart from these, he incorporated introduction, conclusion as well as relevant bibliography.

After establishing the colonial rule, the first target of the colonial power to explore the unknown land for their business sake. Because they did not have any knowledge about the people land resource what they could utilise for their own purpose. In this connection, the colonial power established The Asiatic Society (1784 CE) to know the land and people. Afterwards to educate young colonial officers, two colleges were established Serampore college and Fort William College (1800 CE). But the colonial power did not depend on their endeavours. For the colonial sake, they were trying to accumulate more manpower for their own cause. Young natives had been accumulated in the colonial service by giving them proper western education and western thoughts. In this regard, Hindu college (1814 CE) was established. Perhaps this is the main doorway for the western education and philosophy among the young native generation. Hindu College was the main place for the young generations to know western outlook. But in the Hindu College, three waves were influencing the

students such as—conservatives under the leadership of Radhakanta Deb; Liberal democratic ideas under the leadership of Raja Rammohun Roy and the ultra-liberal ideas under the leadership of H.L.V. Derozio. On account of this, the young generations could gradually feel their physical position in the society as well as under the British colonial rule.

First hundred years of British East India Company rule was completely different from next century. After Sepoy Mutiny, the so-called Victorian rule became different till the independence. This work is an attempt to show how democratic intellectual thought was gradually taking a definite shape in the nineteenth century CE.

In the third chapter, author's view is correctly stated that in the first half of the nineteenth century the primary steps towards constitutional morality had been accelerated with proper goals. The author in fourth chapter, elaborately discussed the Derozio's movement along with his disciples. The idea of the equality of French Revolution was deeply established into the lives of Indians. Derozio and his followers were closely acquainted with the Humanist and Rationalist movements. By their activities they accelerated viewed and political consciousness. The political thoughts and activities of Derozio and his disciples played a significant role in creating democratic environment. Their main motto was to instill a sense of nationality and self-respect among the native Indians.

In this study, author's analytical arguments rightly pointed out the evolution of self respect and the concept of democracy to protect the rights of the Indians. The manifestation of the democratic rights could be glimpsed in the claim of civil rights to the state; it is rightly said 'Indian political thoughts'. The origin of modern Indian political thought originated in colonial Bengal. The book can be considered as a good study to defend his arguments.

Rangankanti Jana
Life Member, The Asiatic Society

ANNOUNCEMENT

All communications relating to publication should be addressed to
The Publication Officer, THE ASIATIC SOCIETY, 1 Park Street, Kolkata-700016,
e-mail : asiaticsocietypublications1788@gmail.com

Visit our website : **https://asiaticsociety.culture.gov.in**

- Information about Books and Journals may be obtained from the Publication Officer, The Asiatic Society, 1 Park Street, Kolkata-700016
- Customers, when order directly to the Society, are requested to observe the following rules:
  - Orders should be addressed to the Publication Officer, The Asiatic Society, Kolkata
  - Payment should be made to the **Account No. 10959203687**, **IFSC : SBIN0000150.** In case of all purchase, payments to be made in advance.
  - The Name, Address, e-mail id and Contact Number to whom the books are to be sent should be written in block letters.

DISCOUNT POLICY (wef 26.08.2024)

Gross Amount		% of discount
BOOKSELLERS / AUTHORS / CONTRIBUTORS		
	Upto Rs. 5000/-	25%
	From Rs. 5001/- to Rs. 10,000/-	$33^{1}/_{3}\%$
	From Rs. 10,001/- to Rs. 50,000/-	40%
	Rs. 50,001 and above	50%
ACADEMIC INSTITUTIONS/LIBRARIES		25% on all purchase
INDIVIDUALS		10% on all purchase

RECENT PUBLICATIONS

Banabibir Jahuranama
edited by Biswajit Halder
₹ 765

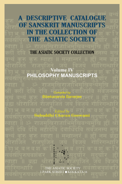

A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Collection of The Asiatic Society, Volume IV : Philosophy
compiled by Bibekananda Banerjee and edited by Subuddhi Charan Goswami
₹ 1575

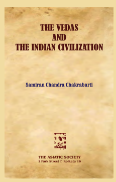

The Vedas and the Indian Civilization
by Samiran Chandra Chakrabarti
₹ 1250

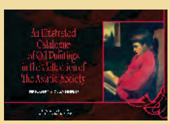

An Illustrated Catalogue of Oil Paintings in the Collection of The Asiatic Society
by Isha Mahammad and Somnath Mukherjee
₹ 2500

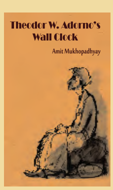

Theodor W. Adorno's Wall Clock
by Amit Mukhopadhyay
₹ 1620

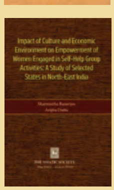

Impact of Culture and Economic Environment on Empowerment of Women Engaged in Self-Help Group Activities : A Study of Selected States in North-East India
by Sharmistha Banerjee and Arijita Dutta
₹ 600

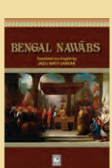

Bengal Nawabs
translated into English by Jadunath Sarkar
₹ 650

Renascent Bengal
with a Foreword by Ramesh Chandra Majumdar
₹ 250

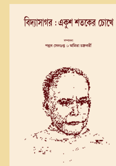

Vidyasagar : Ekush Sataker Chokhe
edited by Pallab Sengupta and Amita Chakravarti
₹ 300

***Tantraloka* by Abhinavagupta**
translated into Bengali with an introduction by Sukhamay Bhattacharyya
₹ 870

Samgita Damodara
translated into Bengali by Mahua Mukherjee
₹ 560

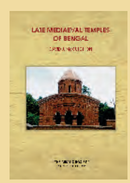

Late Mediaeval Temples of Bengal : Origin and Classification
by David J. McCutchion
₹ 600

***The Akbarnama* of Abul Fazl, Set of Three Volumes**
translated from Persian by H. Beveridge
₹ 5650

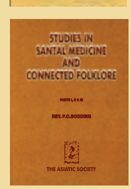

Studies in Santal Medicine and Connected Folklore
by Rev. P. O. Bodding
₹ 1740

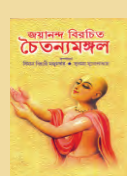

Jayananda Birachita
Chaitanyamangala
edited by Biman Behari Majumdar and Sukhamay Mukhopadhyay
₹ 750

Published by Lieutenant Colonel Anant Sinha, Administrator, The Asiatic Society, 1 Park Street, Kolkata 700016,
Phone: 2229 0779, 2229 7251, 2249 7250 E-mail : asiaticsociety-ask@asiaticsocietykolkata.nic.in
Website: https://asiaticsociety.culture.gov.in
Printed at Arunima Printing Works, 81, Simla Street, Kolkata 700 006. E-mail : arunimaprinting@gmail.com